PANCHAKOTesSAYS
ISSN : 0976-4968
Vol-14, No.-2, November 2023

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কয়েকটি কিশোর-কাহিনিতে নব্য-ঔপনিবেশিক প্রেক্ষিত ও জাদুবাস্তব পরিসর

শ্রুতি মুখার্জ্জী [1*]

[1*] সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, রাজা বীরেন্দ্র চন্দ্র কলেজ, কান্দি, মুর্শিদাবাদ
ই-মেইলঃ srutimukherjeetuli@gmail.com.

সংক্ষিপ্তসার

শিশুপাঠ্য বা শিশুকিশোর কাহিনির অন্তর্বয়ান সর্বদা অতিসরলীকৃত হয় না। কারণ মানবসভ্যতা আজ এক জটিল যুগসন্ধিতে উপনীত। আধুনিকতার বিবিধ পর্বান্তর অতিক্রম করে মানুষ উত্তর-আধুনিক কালপর্বে এসে পৌঁছেছে। শৈশব আজ সত্যিই সারল্য হারিয়েছে। আধুনিকতার উন্মেষ-পর্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জয়যাত্রা সূচিত হয়। জীবনশৈলিতে আসে বিপুল পরিবর্তন। আসে শিকড়বিস্মৃতি। প্রকৃতির সঙ্গে সংঘাত বাধে। মানুষ মানুষকে নয়, মুদ্রাকে ঈশ্বর বলে মানতে থাকে। পৃথিবীকে বীরভোগ্যা বসুন্ধরা ভাবার দুঃসাহস নিয়ে সীমাহীন লোভের চাষ শুরু হয়। একদিকে চলে প্রকৃতির নিষ্কাশন। অন্যদিকে মানুষ পৃথিবীর প্রতিশব্দ দাঁড় করায় কুরুক্ষেত্র। একদা শিকারী-সংগ্রাহক মানুষের অন্যতম সহজ শিকার হয় মানুষই। যা-কিছু সম্পদ, তাকে পুঞ্জীভূত করার লালসায় সম্পদকে সম্পত্তিতে রূপান্তর করে চলে নিয়ত। আর মৃত সম্পদের হিমঘর হয় নিয়ন আলোয় ধাঁধানো নগরসভ্যতা। শীর্ষেন্দু ইটের পাঁজরে ও লোহার খাঁচায় বন্দী প্রাণকে, তার মর্মব্যথাকে জেনেছেন। উত্তর-আধুনিক মনন আধুনিকতার বিষবাষ্পকে খারিজ করে। আর তারই অন্যতম ঢাল জাদুবাস্তবতা। অদ্ভুতুড়ে কিশোর কাহিনিগুলিতে শীর্ষেন্দু তাঁর পাঠককে ঋতপথ দেখান। প্রযুক্তির কানাগলিতে সুকুমার মন যাতে হারিয়ে না যায়, জাদুবাস্তব সিজনিং এর ছলে প্রখর কিছু রাজনৈতিক বয়ান বুনে দেন আখ্যানের শরীরে।

সূচক শব্দ: নব্য-ঔপনিবেশিকতাবাদ, যাদুবাস্তবতা, পুঁজিবাদ, কল্পবিজ্ঞান, অদ্ভুতুড়ে উপন্যাস

জীবনানন্দ দাশের সঙ্গে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের একটি মৌলিক ভিন্নতা আছে। একজন কবি, অন্যজন কথাকার — সেই পার্থক্যের কথা নয়। যদিও জীবনানন্দ উপন্যাস লিখেছেন এবং সেইসব উপন্যাস অনুপম বিস্ফোরণ। জীবনানন্দ *রূপসী বাংলা*-র কবি আবার এই জীবনানন্দ *সাতটি তারার তিমির*, *মহাপৃথিবী*র জন্ম দেন। মহানগরের ধূলিমলিন ঘর্মাক্ত যান্ত্রিক বিষাদবিষ পালন করে জীবনানন্দ নীলকণ্ঠ হয়েছেন। তবে তাঁর সময় কিছু পূর্বের। সাম্রাজ্যবাদী ধনতান্ত্রিক সভ্যতার আগ্রাসন পৃথিবীর দেহপটে গাঢ় রঙের পোঁচ তুলে দিচ্ছে তখন। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় যখন কিশোরপাঠ্য অদ্ভুতুড়ে উপন্যাসগুলি তুলে আনছেন পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলার পাতায়, তখন বিংশ শতাব্দীর সূর্য ঢলে পড়েছে শেষ পাদে। তাঁর

রচনার পাঠক মূলত জেন-এক্স, মিলেনিয়াল এবং জেন-জি প্রজন্ম। প্রায় প্রতিটি কাহিনিতে নগরসভ্যতা হতে এক প্রত্যাহার আছে; আছে গ্রাম দিয়ে নগর ঘেরার শৈল্পিক বার্তা।

উনিশ শতকের সমাপ্তি লগ্নে রবীন্দ্রনাথ আসন্ন শতাব্দীর আত্মাকে অনুধাবন করেন।*নৈবেদ্য* কাব্যগ্রন্থের ৬৪ সংখ্যক কবিতায় তাঁর এই আশঙ্কার প্রকাশ ঘটে–

শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘমাঝে
অস্ত গেল; হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদরাগিনী
ভয়ংকরী[১]

লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু এই বিষচক্রেই বিংশ শতাব্দী পুনরাবৃত্ত হয়। পুঁজিসর্বস্ব ধনতান্ত্রিক সভ্যতা পৃথিবীর মুখ বদলে দেয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতিকে পুঁজিবাদের কাছে বন্ধক রাখে মানুষ। ফলত বন্দী বিবেক। সামন্ততন্ত্রের ফাটল বেয়েই ধনতন্ত্রের জন্ম হয়। তবে প্রযুক্তির পুষ্পকরথে চড়ে নব্য-ঔপনিবেশিক সভ্যতা প্রতাপ বিস্তার করে। পুঁজিবাদকে ইন্ধন যোগায় বিশ্বায়ন, সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তার এবং প্রযুক্তিগত বিবিধ কৃৎকৌশল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে Neocolonialism শব্দের ব্যবহার শুরু হয়। britannica.com –এ এই শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে –

> *The term is now an unambiguously negative one that is widely used to refer to a form of global power in which transnational corporations and global and multilateral institutions combine to perpetuate colonial forms of exploitation of developing countries. Neocolonialism has been broadly understood as a further development of capitalism that enables capitalist powers (both nations and corporations) to dominate subject nations through the operations of international capitalism rather than by means of direct rule.*[২]

এই মন্ত্রেই ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশের উচ্চাকাঙ্ক্ষী নাগরিকের চোখে ভালো থাকার স্বপ্নীল ঠুলি পড়ানো সম্ভব হয়েছে। ভারত তথা বাংলা যখন স্বাধীন হয় বহু শতকের নির্গমন নীতি, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, অবশিল্পায়ন, দু'টি মহাযুদ্ধের খরচ সব মিলিয়ে দেশ অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু। অথচ জনসংখ্যার ভার বিপুল। এই জনসংখ্যা ক্রমে গণতান্ত্রিক উপনিবেশ তথা বাজারে পরিণত হয়। তার সঙ্গে দেশভাগের মতো ঘটনায় জনসংখ্যার ভারসাম্য আরো নষ্ট হয়।পশ্চিমবঙ্গের মতন একদা কৃষি শিল্প বাণিজ্যে সমৃদ্ধ প্রদেশ অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয়। ফলে প্রতিযোগিতা বাড়ে। বাড়ে ইঁদুর দৌড়। ছোট হয় মন। ছোট হয় ঘর। অর্থের অপরিমিত আকাঙ্ক্ষা ক্রমে লোভ থেকে লালসায় পর্যবসিত হয়।

পরিণামে নাগরিক সভ্যতা পরোক্ষ ও রণাঙ্গনের চেহারা নেয়। শ্মশান ঘাট থেকে বিধানসভা, ট্রাফিক থেকে স্কুল সর্বত্রই অন্যকে পিছনে ঠেলে এগিয়ে যাওয়ার অদম্য বাসনা। ছয়ের দশকের শেষাশেষি থেকে গ্রামীণ সভ্যতাকে শোষণ করে নগরের ফুলে ফেঁপে ওঠা মাত্রাতিরিক্ত বৈষম্যের জন্ম দেয়। তাই গ্রামীণ সভ্যতার অর্থনৈতিক ভিত ধনতান্ত্রিক উপনিবেশের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে আর পারে না। পীড়ন ও শোষণ সীমাহীন হলে প্রতিবাদ দানা বাঁধে। গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার দাবি ওঠে। কারণ নগরসভ্যতা গ্রামকে গ্রাস করে নিতে চায়। কৃষি ক্ষেত্রের বুক চিড়ে রেল সড়ক ব্রিজ হতে থাকে। উন্নয়নের লভ্যাংশের গুড় অদৃশ্য পিঁপড়েরা চেটেপুটে নেয়। বনাঞ্চল কেটে কৃষিক্ষেত্র তৈরি হয়।

বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য লোভের দাবানলে বিনষ্ট হয়। ভূগর্ভস্থ জলরাশি ধান চাষের সেচ, নরম পানীয় বহুজাতিক এবং আকাশছোঁয়া বহুতলের চাহিদা মেটাতে মেটাতে ফুরিয়ে আসে। চাষির ছেলে মধ্যপ্রাচ্যে অডজব করে অজ গাঁয়ে দালান কোঠা বানায়। জমি অধিগ্রহণ হয়। অনোন্যপায় ইচ্ছুক চাষী পাসবইতে হাত বুলিয়ে ভাবে - জিতে গেছি। এও একধরনের মানিগ্যাজমের কল্পসুখ। এইভাবে বাংলার প্রাকৃতিক আত্মিক সাংস্কৃতিক সম্ভার বিপন্ন হয়। নতুবা ধনতন্ত্রের হস্তগত হয়। গ্রামীণ সভ্যতার বাণিজ্যিকীকরণে গ্রামের নাড়িটি সর্বপ্রথম ছেঁড়া যায়।

তবে এত কিছুর তলে তলে প্রতিবাদ প্রতিরোধ কি হয়না? লাতিন আমেরিকার জাদুবাস্তব পটভূমির সঙ্গে বাংলার সাদৃশ্য অবশ্যই আছে। কারণ উভয়দেশই শোষণের শিকার। উভয় দেশই ঔপনিবেশিক শোষণের শিকার। উভয়েরই প্রতিবাদের ভাষা উঠে আসে শিকড়ের অনালোকিত পাতালঘর হতে। এ কথা সত্যি জাদুবাস্তবতার উপাদান বাস্তব জগতের দৈনন্দিন ও তার মধ্যে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে সংলগ্ন হয়ে থাকে—বলা যায় এক ধরনের বাচনিক ক্যামোফ্লেজ—উদ্দেশ্য আত্মরক্ষণ, অস্তিত্বের সংগ্রাম। অলৌকিকতা এখানে পরদেশী নয়, লৌকিক অলৌকিক লোকাল ট্রেনের নিত্যযাত্রীর মতো ঠেলাঠেলি করে একে অন্যের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসে ভূতও তাই মানুষের সঙ্গে নৈমিত্তিক জীবন যাপন করে। একসাথে রুখে দাঁড়ায় ক্ষমতালোভী, অর্থলোভী, মানুষপিশাচের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের অদ্ভুতুড়ে উপন্যাসগুলি কোনো সচেতন জাদুবাস্তববাদী বয়ান নয়। তা হওয়া সম্ভবও নয়, কারণ সুরিয়ালিজম এর মতো ম্যাজিক রিয়ালিজমের কোনো ম্যানিফেস্টো ছিল না। ফ্রাঞ্জ রো এর লেখায় এর বৈশিষ্ট্যগুলি প্রথমবার চেনা গেলে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক প্রেক্ষণবিন্দু যত বদলেছে জাদুবাস্তব লিখনশৈলীও অনড় থাকেনি। তাই কোনো বিধিবদ্ধ প্রণালী জাদুবাস্তবতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, আলেহোকার্পেন্তিও, সালমান রাসদি, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় কিংবা অমর মিত্র এঁদের প্রত্যেকের প্রেক্ষিত আলাদা।শীর্ষেন্দুর প্রেক্ষিতও সম্পূর্ণ ভিন্ন। নির্দিষ্ট পাঠক ভবিষ্যতের নাগরিক সরলমতি কিশোর কিশোরীরা। তাই জাদুবাস্তবতার একটি ভিন্ন ছাঁদ ও স্বাদ তাঁর রচনায় লক্ষণীয়।

জাদুবাস্তবতার চরিত্র সম্পর্কে Amaryll Chanady লিখেছেন, “absence of obvious judgements about the veracity of the events and authenticity of the world view expressed by characters in the text.”[৩] এখন *বিপিন বাবুর বিপদ* উপন্যাসে ঘটনার বাস্তবতা বিশ্বাস্য পরিমাণে উপস্থিত। উপন্যাসে প্রতিটি চরিত্রের এবং কার্যক্রম একেবারে বাস্তব ও লৌকিক। অথচ পৃথিবীকে দেখার ধরাবাঁধা ছকের বাইরে চলে যান লেখক। উপন্যাসের ক্লাইম্যাক্সেএসে দেখা যায় মধুবনীর দুর্গম জঙ্গলে পাড়ি দেন বিপিনবাবু এবং আরো অনেকে। তাঁরা দিনের আলোয় ওই ধন-সম্পদকে নেহাতই সিসে ও পাথরকুচি দেখেন। বিপিনবাবু একজন অত্যন্ত কৃপণ ব্যক্তি। ধনসঞ্চয় করে রাখাতেই তাঁর একমাত্র তৃপ্তি। বাড়ির সদস্যরা তার কার্পণ্যের জন্য পেট ভরে খেতেও পান না। এই পরিস্থিতিতে রামভজন আদিত্য নামের জনৈক বৃদ্ধ তাঁকে বিপুল ধনরত্নের হদিস দিতে চান। শর্ত একটাই—একজন অতিশয় কৃপণ ব্যক্তিই তাঁর যাবতীয় ধনরত্নের উত্তরাধিকারী হতে পারেন। তাই তিনি বিপিনবাবুকে নিয়ে পাড়ি দেন মধুবনীর জঙ্গলে। কিন্তু বিপিনবাবু যখন আলোয় এনে হিরের বদলে পাথরকুচি আর আকবরী

মোহরের বদলে সিসে দেখেন, তখন ভজনবাবু তাঁকে এই বলে আশ্বস্ত করেন–"তুমি হলে কৃপণ লোক, এসব তো প্রাণে ধরে খরচ করবে না কখনও সুতরাং ওপরে আনারও দরকার নেই নীচের ঘরে নিয়ে গেলেই দেখবে ওই সিসেগুলো ফের খাঁটি মোহর হয়ে গেছে, পাথরগুলো হয়ে গেছে হিরে। এখন থেকে তুমি নীচের ঘরে বাস করলেই তো হয়।"[৪] তিনি আরো বলেন, "...আসলে মোহরের সঙ্গে সিসের কোন তফাৎ নেই ভেতরের গুণ একটু বদলে দিলেই হয়।"[৫]

--এ কাহিনি আসলে পুঁজিবাদী সভ্যতার বিরুদ্ধে এক তুমুল অট্টহাস্য। কৃপণের ধন, যার সদ্ব্যবহার নেই,তার শুধুই ব্যক্তির সঞ্চয়কে অস্বাভাবিকরূপে স্ফীত করে তোলা ভিন্ন কোনো তাৎপর্য নেই। সেই ধন আলোকিত পৃথিবীতে নিষ্প্রয়োজন।তাছাড়া সোনা আর সিসের মধ্যে পরমাণুর গঠনগত পার্থক্য ছাড়া শ্রেণী বিভাগ প্রকৃতি করেনি। কিন্তু মানুষ তার স্বার্থ অনুযায়ী বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদানের উপর কল্পিত বহুমূল্যতা আরোপ করে। আসলে পুঁজি ও তার সঞ্চয় সম্পূর্ণটাই একটা কল্পিত রূপকথা – আজকের দিনের ডিজিটাল কারেন্সির মতো কল্পিত এক মুদ্রানীতি।

এই উপন্যাসে কোনো অলৌকিক জাদুকরী কার্যকলাপ নেই। বরং বাস্তবের মানুষের মনোজগতে যে বিরাট বন - তাকে মধুবনীর জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে উপড়ে ফেলেন রামভজন আদিত্য। খরগোশ, হনুমান, অদ্ভুত টিয়াপাখি কিংবা তিন ডাইনি এরা সকলেই মানুষের মনের অবচেতন চোরাকুঠুরিতে পড়ে থাকা নানান অজ্ঞাত প্রবৃত্তি। এই জাদুবাস্তবকে আড়াল করার জন্য নয়। বরং বাস্তবতার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসা মায়াআয়না হয়ে ওঠে।মানুষকে তারকৃতকর্মের স্বরূপ দেখায়। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের চেহারা দেখায়।

জাদুবাস্তব আখ্যানের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো মিথ- পুরাণের ব্যবহার।

Maggie Ann Bowers তাঁর Magic(al) Realism গ্রন্থেলিখেছেন–

> *...if we are to identify those writers whose magical realism originates predominantly from the beliefs of they are own cultural context, we find magical realism, in fact, has become the most common and most recognized form of magical realism. Writers such as Garcia Marquez, Rushdie, Morrison and Okri all derive the magical realist elements of their texts mythology, cultural beliefs and folklore of the cultural context in which their fiction is set—which is also their own.*[৬]

মোহন রায়ের বাঁশি উপন্যাসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদিকল্প ব্যবহৃত হয়েছে। পুরান অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণ একাধারে বংশীধারী মাখনচোর আবার বিশ্বপালক ও দুষ্টের দমনকারী। এখন উপন্যাসে জাদুকরী বাঁশির স্রষ্টা মোহন রায়। যাঁরা এই বাঁশি বাজাতে জানতেন তাঁরা হলেন মোহন রায় স্বয়ং, নবীন রায় ও শ্রীনিবাস– প্রতিটি নামই শ্রীকৃষ্ণের। এমনকি মোহন রায়ের ভূতের নির্দেশে চরম মুহূর্তে মহানন্দকে গুলি করে করেন যে দারোগা তার নামও বিষ্ণুরাম। শ্রীনিবাস নিজে একজন চোর হলেও সাধারণ কোনো চোর নন—ঐহিক কোনো বস্তুর প্রতি তাঁর কোনো লোভ নেই। বরং তিনি শিল্পী মানুষ—সাধারণ মানুষের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। তাই উপন্যাসের একেবারে শেষে শ্রীনিবাস নিজেই বলেন, "আমার কি অল্পে হয়?

অল্পে আমার মন ভরে না বলে ভগবান যে আমাকে গোটা বিশ্ব সংসারটাই দিয়ে রেখেছেন!"[৭]—এই উক্তিতে লেখক শ্রীনিবাসের প্রকৃত পরিচয় এর ইঙ্গিত দিয়ে রাখেন।

Maggie Ann Bowers **লক্ষ করেন**—

> *Magical realism has become a popular narrative mode because it offers to the writer wishing to write against totalitarian regimes a means to attack the definitions and assumptions which support such systems (e.g. colonialism) by attacking the stability of the definitions upon which these systems rely.*[৮]

মহানন্দ নিজের সম্পর্কে বলেছে, "আমি কাজের লোক, হাতে ক্ষমতা পেয়েও যদি কেউ সেই ক্ষমতা কাজে না লাগায় তাহলে সে আহাম্মক"[৯]—প্রকৃত ঔপনিবেশিক ক্ষমতাদম্ভীর মতোই কথা। মহানন্দ মোহন রায়ের বাঁশির তিন নম্বর বিধ্বংসী সুর ব্যবহার করে সরকারের কাছে গচ্ছিত জনসাধারণের অর্থ যাকে public property বলে তা লুটে নিতে চায়। গণতান্ত্রিক বণিককুল যেভাবে সরকারি জমি লিজ নেয় বা তথাকথিত অলাভজনক সরকারি সংস্থার বেসরকারিকরণ হয়ে যায়—সেই রূঢ় বাস্তবতাই জাদুবাঁশির তৃতীয় সুরের অলৌকিকতার লৌকিক পরিণাম হয়ে আসে। এখানেও ভূত আছে— মোহন রায়ের ভূত—যেঅশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে—শীর্ষেন্দু সব উপন্যাসেই ভূত আসে ত্রাতা বা রক্ষক হয়ে।

মোহন রায়ের বাঁশির যে তিন ধরনের সুর তাও প্রবলভাবেই জাদুবাস্তব। কারণ প্রথম সুরে মানুষের মধ্যে আসে ভালো লাগা, দ্বিতীয় সুরে সুপ্ত, আচ্ছন্ন দশা। এবং পরিশেষে তৃতীয় সুরে সর্বনাশ। রাজনৈতিক কূটচক্র এবং পুঁজিবাদী পৃথিবীর অভিসন্ধি ঠিক এই তিন স্তরেই বিভক্ত।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের *অদ্ভুতুড়ে* উপন্যাস জাদুবাস্তব উপাদানে ঠাসা। কল্পবিজ্ঞান ও থ্রিলারের মোড়ক সরালেই তা স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। দুর্বল নিরীহ বিজ্ঞানের মাস্টারমশাই ভুবনবাবু ল্যাবরেটরিতে বাচ্চাদের এলোপাথাড়ি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার পরিণামে অল্পবয়সী দুলালবাবুতে রূপান্তরিত হন। যাঁর মধ্যে পূর্বতন দুলালবাবুর ভালোমানুষ সত্ত্বা পরাজিত হয় ক্ষণে ক্ষণে। হঠাৎ পাওয়া বৈজ্ঞানিক ক্ষমতায় শক্তিধর দুলালবাবু চুরি, ডাকাতি, খুনের চেষ্টার মতো অপকর্মে যুক্ত হতে থাকেন। কারণ তাঁর নিজের শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার কোনো ক্ষমতাই নেই। পাঁচু মোদকের মতো ধুরন্ধর চোর তাঁকে ব্যবহার করতে থাকে ইচ্ছামতো। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। দুলাল সেন ভূত বিক্রি করার ব্যবসা শুরু করবেন বলে স্থির করেন। পুঁজিবাদী সভ্যতা অর্থের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে যা কিছু লাভজনক বলে মনে করে তাকেই পণ্যে পরিণত করে—অতীত ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ভাষা, প্রাকৃতিক সম্পদ বা সৌন্দর্য সবই পুঁজিবাদী লোভের লেলিহান শিখায় স্বাহা হয়ে যায়। দুলালবাবুর মতই ধনতান্ত্রিক নব্য পুঁজিবাদের লোভের নেশা সীমাহীন। পাঁচু মোদক তাঁকে সাবধানও করে, "আপনার সবই ভালো দুলালবাবু কিন্তু দোষের মধ্যে ওই খাঁইটা। আপনি অল্পে খুশি নন, কেবল আরও চান একসঙ্গে অত চাইতে নেই।"[১০]

দুলালবাবু ভুবন রায়কে বোকা বানিয়ে এ-ও বলেন, "আপনার ক্ষমতাতে তো আপনি আলু দিয়ে অ্যাটম বোমা, মোচা দিয়ে রকেট, কি এক নস্যির ডিবে দিয়ে নিউক্লিয়ার সাবমেরিন বানিয়ে ফেলতে পারেন।"[১১]—এখানে লক্ষণীয় যে, বিজ্ঞানের যে কটি আবিষ্কারের কথা বলা হল সবই মারণাস্ত্র, বিধ্বংসী, যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়।এই যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে ট্রিলিয়ান ডলারের অস্ত্র ব্যবসা চলে পৃথিবী জুড়ে। আর অস্ত্র

ব্যবসায়ীদের বাজার হল যুদ্ধক্ষেত্র। তাই ছলে বলে কৌশলে যুদ্ধ বাধানোটাও ধনতান্ত্রিক নব্য-ঔনিবেশিকতার অভিসন্ধি। ভুবন রায় নিজে প্রাক্তন মিলিটারি অফিসার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর মগজধোলাই কোনোভাবে ঘটেছিল বা তিনি এতটাই নির্বোধ যে বিশ্বাস করতেন –"দেশের জন্য যুদ্ধ করতে করতে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দেবেন এটা তাঁর অনেক দিনের সাধ"[১২]। তাহলে দেখা যাচ্ছে যুদ্ধ ব্যবসায়ীরা যুদ্ধে যায় না ঠিকই। তবে যোদ্ধাদের মাথায় যুদ্ধপ্রীতিকে দেশপ্রেম বলে উসকে দিয়ে কার্যসিদ্ধি করে। কারণ যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করতে তো যোদ্ধা প্রয়োজন আর সেইসব ক্রমে মস্তিষ্কহীন যুদ্ধ-অস্ত্রেই পর্যবসিত হয়।

দুলাল সেন চরিত্রের ছদ্মবেশে ধনতান্ত্রিক পুঁজিসর্বস্ব সভ্যতার আসল রূপটি আভাসিত হয়। বৈজ্ঞানিক মেধার মতো কাব্য প্রতিভাও বাজারি পণ্য হয়ে যায়,"এঁরা সাপ্তাহিক নবযুগ পত্রিকার লোক, কবিতা কিনতে বেরিয়েছেন। এক -একটা কবিতা একশো থেকে দু'শো টাকা"[১৩]আবার ভুবন বাবুর মতে,"কবিতাই হবে আমাদের ফ্যামিলি বিজনেস।"[১৪] কিন্তু এখানেই শেষ নয়, যারা কবিতা লেখার জন্য রেট দেয় তারাই আবার অকবিকে কবিতা সাপ্লাই দিয়ে দুইতরফা ব্যবসা করে নেয়।

ঐন্দ্রজালিক হেলমেট এবং পরির কৌটোর সঙ্গে কিশোর ভুতোর কথোপকথন ইঙ্গিতবাহী। আবিষ্কারের মদমত্ততা প্রযুক্তির নেশায় নতুন প্রজন্মকে আজ ক্রমশ আচ্ছন্ন করে তুলেছে। ভিডিও গেম, ক্যালকুলেটর, কম্পিউটার– এসবই প্রযুক্তির দাক্ষিণ্য সন্দেহ নেই। মানুষের হিতার্থে ব্যবহৃতও হয়। তবে অনর্গল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অতিব্যবহারে মানব মস্তিষ্কের ধার কমে আসছে। ভাবা প্র্যাকটিস করতেও ভুলতে বসেছে তথাকথিত শিক্ষিত মানুষ। তাই ভুবন রায় দুধের হিসেব করতে হিমশিম খেলেও গোয়ালা খুব সহজেই তা করে ফেলে। ভুতোর প্রতি পরিদের সতর্কবার্তা ছিল,"সুপার ব্রেন যত বেশি ব্যবহার করবে, তত তোমার নিজের মস্তিষ্ক নিস্তেজ হয়ে যাবে।"[১৫] Maggie Ann Bowers এর মতে–

> *[...]in marvelous and magical realism 'magic' refers to any extraordinary occurrence and particularly to anything spiritual and unaccountable by Rational Science. The variety of accurrence in magic(al) realist writing includes ghost ,disappearances, extraordinary talents and strange atmospheres but does not include the magic as it is found in a magic show.*[১৬]

অর্থাৎ সূত্রাকারে বললে -

যুক্তিগ্রাহ্য বিজ্ঞানের বাইরের ঘটনা–> ভুবন রায়ের তৈরি যন্ত্রের আকাশে ওড়া।

ভূত–> জনার্দন, লম্বোদর ওপ রীদের কার্যকলাপ।

অদৃশ্য হওয়া–> বৃদ্ধ দুলাল সেনের অল্পবয়সী দুলাল সেনের মধ্যে অদৃশ্য হওয়া।

অলৌকিক ঘটনা–> হেলমেটের অত্যাশ্চর্য কারিগরি।

অস্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তা–> দুলাল সেন, ভুতো উভয়ের মধ্যেই লক্ষিত হয়।

অদ্ভুত পরিবেশ–> ভুবন রায়ের ল্যাবরেটরির পরিবেশ।

দুধ সায়রের দ্বীপ উপন্যাসে মানুষের বাণিজ্যভাবাপন্ন আগ্রাসী আদায়ী মানসিকতার প্রতিবর্ত রাজা প্রতাপচন্দ্রের স্বপ্নে।তিনি সায়র তৈরি করার পরেও মাটি থেকে জল ওঠেনি। তিনি স্বপ্ন দেখেন মা-চামুণ্ডা বলছেন–"ওরে প্রতাপ, কিসের জোরে তোর এত বিষয় সম্পত্তি, তা ভেবে দেখেছিস? মাটি থেকেই না

তোর এত আয় হয়। তা মাটি কে কি কিছু দিস হতভাগা? ভালো চাস তো সায়রে ঘড়া ঘড়া দুধ ঢাল নইলে ওই দহে কস্মিনকালেও জল হবে না।"[১৭]—এখানে স্পষ্টতই প্রাকৃতিক সম্পদের পুনর্ব্যহারের বার্তা। সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা গেছে পৃথিবী থেকে মাত্রাতিরিক্ত ভূগর্ভস্থ জল তুলে নেওয়ার ফলে পৃথিবীর অক্ষ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ১৯৯৩ থেকে ২০১০ পর্যন্ত প্রায় ২০০০ গিগাটন ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলন করা হয়।এর কারণ শুধু সেচ কিংবা পানীয় জলের চাহিদা নয়, নরম পানীয় বহুজাতিকদের অবদান বিপর্যয়ের মুখ্য কারণ।[১৮]

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের প্রায় প্রতিটি কিশোর পাঠ্য কাহিনিতেই নব্য বনিককুল, বাজারি মানসিকতা, প্রাকৃতিক সম্পদের অপহরণ এবং লোভের সর্পিল রূপ ধরা পড়ে ।যুদ্ধ আর অস্ত্র ঘিরে কত না দেশভক্তি ও বীরত্বের ফ্যান্টাসি-মোড়ক প্রচারিত। শীর্ষেন্দুর উপন্যাসের বয়ানে এক অদ্ভুত প্লাজমা স্টেট লক্ষ করা যায়। খাচ্ছি অথচ গিলছিনা-র ছদ্মবেশ, কখনও বা জাদুবাস্তব পরিসর রচনা করেন তিনি। অপরিমিত অর্থলোভ মানুষকে শুধু প্রশ্নচিহ্নের গলিতে পৌঁছে দেয়। নাগরিক মানসিকতার গ্লানি বিশ শতকের মানবজীবনের এক আবশ্যিক অভিশাপ। বেশ কিছু কাহিনিতে শীর্ষেন্দু জাদুবাস্তব লিখনশৈলী গ্রহণ করেছেন। নব্যঔপনিবেশিক ধনতন্ত্রের স্মুদ ক্রিমিনালদের প্রকৃত পরিচয় উদঘাটন করার জন্য। আর এই জাদুবাস্তব কুহকই কিশোর প্রজন্মের মস্তিষ্কে ভাল আর মন্দের বোধের বীজ সম্ভাবনা রাখে। দুয়ের মাঝে যে সূক্ষ্ম বিভাজনরেখা তার contourকে ধরিয়ে দেয়।

তথ্যসূত্র:

১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *নৈবেদ্য*। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ: কলিকাতা, ১৩০৮, পৃ. ৭১।

২। https://www.britannica.com/topic/neocolonialism

৩। Chanady, Amaryll Beatrice.*Magical Realism and the Fantastic:Resolved Versus Unresolved Antinomy*. Garland: New York, 1985, p-30.

৪। মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু।*বিপিনবাবুর বিপদ*। আনন্দ পাবলিশার্স: কলকাতা, ১৯৯৮,পৃ. ৮১।

৫। তদেব।

৬। Bowers, Maggie Ann. *Magic(al) Realism*. Routledge: London, 2004, p- 88, PDF.

৭। মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু। *মোহনরায়ের বাঁশি*। আনন্দ পাবলিশার্স: কলকাতা, ২০০৪,পৃ. ১১২।

৮। Bowers, Maggie Ann. *Magic(al) Realism*. Routledge: London, 2004, p- 4, PDF.

৯। মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু। *মোহনরায়ের বাঁশি*। আনন্দ পাবলিশার্স: কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ১০৫।

১০। মুখোপাধ্যায়,শীর্ষেন্দু। *অদ্ভুতুড়ে*। পঞ্চম সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১৩৭-১৩৮।

১১। তদেব।পৃ. ১৪৭-১৪৮।

১২। তদেব।পৃ. ২০।

১৩। তদেব।পৃ.১৫৬।

১৪। তদেব।পৃ. ১৬৪।

১৫। তদেব।পৃ. ১৭২।

১৬। Bowers, Maggie Ann. *Magic(al) Realism*. Routledge: London, 2004, p- 19, PDF.

১৭। মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু। *দুধ সায়রের দ্বীপ*। আনন্দ পাবলিশার্স: কলকাতা, ১৯৯৭।পৃ. ৮।

১৮ https://m.economictimes.com/news/new-updates/excessive-groundwater-extraction-is-causing-earths-tilt-to-shift-reveals-study/articleshow/101717256.cms